সবচেয়ে পুরনো রাস্তা চিৎপুর

পথিক

কলকাতার অলিগলির ইতিহাসে চিৎপুরের নাম সর্বাগ্রে। কারণ প্রাচীনত্ব আর ঐতিহ্যে এই রাস্তাটি শহরের পথ - কুলে মুখ্য কুলীনের স্থান অধিকার করে রয়েছে। চিৎপুর যেন কোন বনেদী ঘরের বড়বাবু, কালের গতিতে আজ তার জৌলুস ম্লান হলেও চেহারার আভিজাত্য চাপা পড়েনি।

চিৎপুরের জন্মলগ্ন অর্থাৎ কবে রাস্তাটি প্রথম তৈরি হয় তার সঠিক হিসেব পাওয়া মুশকিল। প্রাচীন মঙ্গলকাব্য, ১৪৯৫ - ৯৬ সালে রচিত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাজিয়' কাব্যে চিৎপুরের উল্লেখ আছে। তবে ঐ অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত বলে অনেকের ধারণা এরপর আজ থেকে সাড়ে তিনশ বছর আগে যোড়শ শতাব্দীর শেষে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' চিৎপুরের উল্লেখ পাই। সেখানে দেখি সাধু শ্রীপতির নৌকো ভাগীরথিতে তরতর করে ভেসে চলেছে—

ত্বরায় চলিত তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর সালিখা এড়াইয়া যায়।।

শুধু জলপথে নয়, স্থলপথেও মোগল আমল থেকেই রাস্তাটি কালীঘাটে যাবার প্রধান পথ ছিল। তাই এর আরেকটি নাম হয় 'তীর্থযাত্রার পথ'।

'চিৎপুর' এই নামকরণ সম্পর্কে সকলেই প্রায় একমত। কাশীপুর অঞ্চলে শাক্তদের আরাধ্যা চিত্রেশ্বরী অথবা চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দির আজও বর্তমান। ঐ দেবীর নাম থেকেই নাকি চিৎপুর নামের উৎপত্তি। অনেকে অবশ্য বলেন চিত্রপুর থেকে চিৎপুর। তবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে যে ভাবে চিৎপুরের উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে মনে হয় চিৎপুর সে যুগে একটি গ্রামেরই নাম ছিল। জনশ্রুতি অনুসারে 'চিতে' নামে এক ডাকাত নাকি ঐ দেবীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু জনৈক ঐতিহাসিক এই মত প্রকাশ করেছেন যে, টোডরমল্লের রাজস্বের মুহুরী মনোহর ঘোষ এই চিত্তেশ্বরী মূর্তি স্থাপন করেন।

এককালে চিৎপুর ডাকাত ও কাপালিকদের আড্ডা ছিল। ঐ দেবীর সামনে নাকি বহু নরবলি হয়। আর চিৎপুরের রাস্তায় যে বাঘের সাক্ষাৎ মিলত, ১৮২৫ সালে 'সমাচার দর্পণে'র এক খবরেই তার উল্লেখ রয়েছে।

চিৎপুর অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। ইংরেজদের উপর তিতিবিরক্ত হয়ে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা ১৭৫৬ সালে যখন সসৈন্যে কলকাতা আক্রমণের জন্য আসেন তখন চিৎপুর খালের কাছে ইংরেজরা নবাবকে বাধা দেয়। নবাবের সেনাপতি মীরজাফর নাকি চিৎপুরে সৈন্য স্থাপন করে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেন। বাংলার সেই দুর্দিনের ইতিহাসের স্মৃতি জড়িয়ে আছে চিৎপুরের পথে। আর চিৎপুরের ধুলোয় মিশে আছে অসংখ্য সতীর পুণ্য দেহাবশেষ। ১৮২৮ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার আগে এই পথের ধারেই নাকি ধু - ধু জ্বলেছে অসংখ্য সতীদাহের চিতা।

কিন্তু শুধু তো সতীর কান্না নয়। নটীর নূপুরনিক্কণ মিশে রয়েছে চিৎপুরের হাওয়ায় হাওয়ায়। কান পেতে শুনলে আজও জনাকীর্ণ রাস্তার প্রচণ্ড আওয়াজ ছাপিয়ে তা শোনা যায়। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ বহুগুণী ও বাঈজীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরই দৌলতে কলকাতার চিৎপুর রোড প্রভৃতি এলাকায় নাকি বাইজীদের বসবাস শুরু হয়।

চিৎপুরের গরানহাটা অঞ্চলে কীর্তনের একটি বিশেষ ধারার (গরান হাটি) উৎপত্তি। শুধু গানবাজনা নয়, চিৎপুরকে কেন্দ্র করে শোভাবাজার বটতলাতে কবি - গান, যাত্রা, হাফ আখড়াইয়ের এবং শখের থিয়েটারের চর্চা শুরু হয়। চিৎপুরের মধুসূদন সান্যালের বাড়ির উঠোনে ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক 'নীল দর্পণ' অভিনয়ের সঙ্গেই বাঙলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূত্রপাত হয়। সে হল ১৮৭২ সালের কথা।

হিন্দু কলেজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এই চিৎপুরে। আদি ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাতও ঐখানে। চিৎপুর রোড আর তাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ আমলে যে 'কলকাতা - কালচার' এর জন্ম হয়, আশপাশের ধনী শিক্ষিত পরিবারের কৃতী ও উৎসাহী পুরুষরা ছিলেন সেই সংস্কৃতির পুরোধা। আজ বালীগঞ্জ বা নিউ আলিপুরে আর এক ধরেনের বাঙালি 'কালচার' গড়ে উঠেছে বটে; কিন্তু চিৎপুর কালচারের বনেদীয়ানা তাদের নাগালের বাইরে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক সময় চিৎপুর রোডের এক বাড়িতে বাস করেন এবং তাঁর অনেক সাহিত্যকীর্তি ঐ বাড়িতেই রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায়ও চিৎপুর অঞ্চলের টুকরো টুকরো নানা ছবি পাওয়া যায়। চিৎপুরকে ভালোবেসে তিনি 'আমাদের চিৎপুর' বলে গেছেন 'ছেলেবেলা'র এক জায়গায়। চিৎপুরের প্রাচীন বিদ্যালয় 'ওরিয়েন্টাল' সেমিনারী'তে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন ছাত্র ছিলেন।

তবে প্রায় একশ বছর আগেকার চিৎপুরের খাঁটি রূপ যদি দেখতে চান তো যেতে হবে 'হুতোম' -এর কাছে। তাঁর নক্সায় চিৎপুরের রূপ আলোকচিত্রের মত ফুটে উঠেছে: —'এদিকে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় শহর আবার গুলজার হয়েছে। মধ্যাবস্থ গৃহস্থরা বাজার করতে বেরিয়েছেন, সঙ্গে চাকর ও চাকরানীরা ধামা ও চাঙ্গারি নিয়ে পেছু চলেছে। চিৎপুর রোডে মেঘ কল্লে কাদা হয়; সুতরাং কাদার জন্যে পথিকদের চলবার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। কেউ পয়নালার উপর দিয়ে, কেউ খানার ধার দিয়ে জুতো হাতে করে কাপড় তুলে চলেছেন।'...

বৃষ্টি হলে প্রায় - ফুটপাতহীন চিৎপুর রোডে কাদার হাত থেকে আজও পথিকের নিস্তার নেই। আর বাজার করনেওয়ালাদের সাক্ষাৎ আজও চিৎপুরে যথেষ্ট মিলবে।

'তীর্থযাত্রার পথ' চিৎপুর আজ 'বাজার পথে' রূপান্তরিত হয়েছে। ঐখানে নতুন বাজার টেরিটি বাজার, অ্যালেন মার্কেট ইত্যাদি তো আছেই; তাছাড়া লালবাজার— লোয়ার চিৎপুর রোডের শুরু থেকে বাগবাজারের খালধারের আপার চিৎপুরের শেষ পর্যন্ত ক্রমাগত অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলেছে দোকানের সারি।

কি পাওয়া যায় না চিৎপুরে?

খাবার - দাবার ওষুধ - পত্র সব কিছু দোকান ত আছেই চিৎপুরে, তাছাড়া ভাল সটকা চান ত যেতে হবে চিৎপুরে, বাড়ি করতে চান, ঐখানে পাবেন ইট - সুরকি - বালি। প্রতিমা কিনতে যেতে হবে কুমোরটুলিতে, দর্মপুস্তকের দরকার হলে যেতে হবে চিৎপুরে। আর পুজোপার্বণ উপলক্ষে যাত্রা গানের আসর বসাতে চাইলে চিৎপুরে না গিয়ে উপায় নেই।

হিন্দুদের নানা মন্দির; মুসলমানদের নাখোদা মসজিদ, ইমামবাড়া; দিগম্বর জৈন মন্দির চিৎপুরে অবস্থিত। আর হিন্দুদের 'মহাতীর্থ কাশী মিত্র এবং নিমতলা ঘাটে যেতে হয় চিৎপুর পার হয়েই। 'পতিতোদ্ধারিণী' গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যায় চিৎপুরের অলিগলি।

বর্তমানে কলকাতা যে 'কস্‌মোপলিটান সিটি' অর্থাৎ এই শহরের বিশ্বের প্রায় সকল দেশের লোকই যে নীড় বেঁধেছে পাশাপাশি— তারও প্রকৃষ্ট পরিচয় চিৎপুর রোডের মত শহরের আর কোথাও মিলবে না। চিৎপুরে আজ নানা জাতি নানা ধর্মের মানুষ বসবাস করছে।

রমাপদ চৌধুরী সম্পাদিত 'অচেনা এই কলকাতা' গ্রন্থ থেকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত।